بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ

প্রিয় শিক্ষার্থী,

আমরা প্রথম কিছু দিন ইসলামের মৌলিক ধারণাগুলো সম্পর্কে জানব। তবে, এই জানাটা হবে একটু অন্যভাবে। শিক্ষক তোমাদের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমরা হয়তো কোথাও ঘুরতে যাবে, কিছু কাজ করবে, বন্ধুরা মিলে নিজেরা কে কী জানো তা আলোচনা করবে। আর এই সব কাজ করতে করতে তোমরা ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণা পাবে। এখানে একটি ব্যাপার জেনে রাখো, তুমি হয়তো ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে অনেক কিছু আগে থেকেই জানো। সেই বিষয়গুলো তুমি বন্ধুদের জানাতে পারবে। বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে এবং শিখতে তোমরা একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে। চলো জেনে নিই কী সেই অভিজ্ঞতা!

ঘুরতে যাওয়া

প্রথমেই শিক্ষক তোমাদের সবাইকে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যেতে পারেন। সেখানে তোমরা সবাই ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু দেখতে পারবে। এ সময় তোমাকে শিক্ষক কিছু প্রশ্ন করবেন, তুমি সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। উত্তর ভুল হলেও কোনো সমস্যা নেই। আমরা সবাই ভুল করতে করতেই সঠিক বিষয়টি শিখি। এ সময় তোমার মনে নানা প্রশ্নও জাগতে পারে। তুমি অবশ্যই শিক্ষককে সেই প্রশ্নগুলো করবে। মনে রাখবে, প্রশ্ন করার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। জানার জন্য তুমি তোমার শিক্ষককে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারো।

এই ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে তোমার মূল কাজ হলো আশপাশের সবকিছু মনোযোগ দিয়ে দেখা। আমরা আমাদের আশপাশের অনেক কিছুই কিন্তু সময়ের অভাবে ভালোভাবে লক্ষ্য করি না। সবকিছু লক্ষ্য করবে আর বুঝতে চেষ্টা করবে যে সেগুলো কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষক যদি তোমাদের বিশেষ কিছু দেখান, তাহলে সেটা মনোযোগ দিয়ে দেখবে আর শিক্ষকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে।

লক্ষ করো, তোমাদের সাথে কি এমন বন্ধু আছে, যার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা যে চোখে দেখতে পায় না? তাহলে এমন বন্ধুকে সাহায্য করা কিন্তু তোমার দায়িত্ব! তোমার বন্ধুকে বলো যে তোমরা কী দেখছ আর কি কি করছ। সেই বন্ধুর সাথে মিলে শিক্ষকের বলা সব কাজগুলো করো।

প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

ঘুরতে গিয়ে শিক্ষক তোমাদের যে প্রশ্ন করেছিলেন তুমি কি সেগুলো নিয়ে ভেবেছ? প্রশ্নগুলোর কি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছ? তোমার বন্ধুরা যে উত্তর দিয়েছে তা কি তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছ? নিশ্চয়ই এতক্ষনে তুমি বেশ কিছু নতুন জিনিস জেনেছো। অথবা, এমনও হতে পারে যে তুমি আগে থেকেই এগুলোর অনেক কিছু জানতে! এখন তোমাকে শিক্ষক একটি আনন্দদায়ক কাজ করতে দেবেন। তোমাকে কী করতে হবে জানো? এখন তুমি যা যা আগে থেকে জানো আর যা যা ঘুরতে গিয়ে জানলে, তোমাকে সেই সবকিছু লিখে ফেলতে হবে। তাহলে এখন নিচের কাজ-১ করে ফেলো!

কাজ-১

তোমার মতে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কী? সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

মনে রাখবে, সব সময় যে সবার সব লেখা বা জানা সঠিক হবে তা নয়। মাঝে মধ্যে কিছু ভুল হতেই পারে। তাই ভয় বা লজ্জা না পেয়ে তোমাদের মতো করে এই প্রশ্নটির উত্তর লিখে ফেলবে। এরপর আমাদের আরও অনেক কাজ আছে!

তুমি নিশ্চয়ই সুন্দরভাবে কাজ-১ সম্পন্ন করেছ। তার মানে হলো এখন তোমার কাছে একটি তালিকা আছে, যেখানে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে লেখা আছে। তবে তালিকার কিছু জিনিস ভুলও হতে পারে, তাই না? কারণ, তালিকাটিতে তো তুমি শুধু তোমার যা যা মনে হয় সেগুলো লিখেছ। এখন তাহলে আরেকটা কাজ করতে হবে।

তবে আরেকটা কাজ করার আগে জেনে নিই কেন আমরা এতসব কাজ করছি। তোমাদের শিক্ষক নিশ্চয়ই তোমাদের জানিয়েছেন সেটা। তা-ও আবার জানাচ্ছি, তোমাদের মূল কাজ হলো আসলে একটি খুব সুন্দর দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা আর সেটা সবার সামনে উপস্থাপন করা। কারণ, আমরা সবাইকে জানাতে চাই যে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে কতকিছু জানো!

কিন্তু কেবল তোমাদের ছোট ছোট তালিকা, ভাবনা আর ধারণা দিয়ে তো একটা সুন্দর দেয়াল পত্রিকা হবে না! কারণ, নিজেদের জানায় তো কিছু ভুলও থাকতে পারে। তাই এখন তোমার এই জানার জগৎটাকে আরও বড় করতে ছোট ছোট আরও কিছু কাজ করতে হবে। তাহলে এখন এসো জেনে নিই আমরা এই দেয়াল পত্রিকাটি তৈরি করার জন্য ধাপে ধাপে কি কি কাজ করব।

১. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর তালিকা তৈরি করা

↓

২. তথ্য সংগ্রহ করে তালিকা সমৃদ্ধ করা

↓

৩. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আরও জানা

↓

৪. দেয়াল পত্রিকার জন্য লেখা, কাগজ, কলম, রং, ডিজাইন ইত্যাদি ঠিক করা

↓

৫. শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে লেখার ভুল সংশোধন করা

↓

৬. দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধনের জন্য অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা

↓

৭. দেয়াল পত্রিকা লেখা, সাজানো এবং দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধনের জন্য অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বা দাওয়াত কার্ড তৈরি করা

↓

৮. আমন্ত্রণপত্র বা দাওয়াত কার্ড বিতরণ করা এবং অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া

↓

৯. অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন করা

তাহলে দেখো, দেয়াল পত্রিকা তৈরির প্রথম ধাপের কাজ কিন্তু তুমি করে ফেলেছ। এখন দ্বিতীয় ধাপের কাজের জন্য তুমি কারও কাছে জানতে চাইবে, ইসলামের মৌলিক বিষয় বা মূল বিষয়গুলো আসলে কি কি? পারবে না? বাড়িতে বড় যে কাউকেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারো তুমি। বাড়িতে কেউ না থাকলে তোমার পরিচিত বড় কারও সাহায্যও নিতে পারো। অথবা, তুমি তোমার যে কোনো শিক্ষকের কাছ থেকেও বিষয়গুলো জেনে নিতে পারো। তারপর কী করতে হবে জানো? তুমি যে প্রথমে একটি তালিকা তৈরি করেছিলে, সেটিতে নতুন যা যা জানলে তা লিখে ফেলতে হবে। তাহলে কী হবে? তাহলে তোমার তালিকাটি এখন আরেকটু বড় আর সুন্দর হবে! তাহলে এবার তোমার কাজটি হলো-

কাজ-২

বড় কারও কাছ থেকে জেনে নিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত তোমার তালিকাটি সমৃদ্ধ করো।

আশা করি তুমি কাজ-২ ভালোভাবে শেষ করেছ। এখন কী হলো বলোতো? এখন তোমাদের বন্ধুদের কাছে একটা করে বড় তালিকা আছে, তাই না? আমাদের এবারের কাজটা আরও অনেক আনন্দের! এবার আমরা বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে যাব। কীভাবে দল তৈরি করতে হবে তা শিক্ষক তোমাদের বলে দেবেন। দলে ভাগ হয়ে এবার তোমরা দলের সবার তালিকাগুলো দেখবে। আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করবে যে কার তালিকায় কী আছে। আরও দেখবে তোমার তালিকার কোনো কিছুর সঙ্গে তোমার দলের কোনো বন্ধুর তালিকার কিছু মিলে যায় কি না। মিলে গেলে তো খুব ভালো হলো! তার মানে তোমরা একই জিনিস জেনেছ। তবে, হয়তো সবার তালিকাতেই এমন কিছু থাকবে যা অন্যদের তালিকায় নেই। এ সবকিছু তোমরা সবাই একসঙ্গে গোল হয়ে দলে বসে বোঝার চেষ্টা করবে। আর তারপর তোমাদের আরেকটি কাজ করতে হবে। কাজটা হলো-

কাজ-৩ (দলগত কাজ)

দলের সবার তালিকায় যা যা আছে তার সবকিছু মিলিয়ে একটি বড় তালিকা তৈরি করো।

কাজ-৩, এটি একটা দলগত কাজ। এর মানে হলো, তোমাকে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে একদল হয়ে কাজটা করতে হবে। আর কাজটা করার পর দলে এখন মাত্র একটি করে বড় তালিকা থাকবে।

দলগত উপস্থাপনা

এখন তোমাদের দলগুলোর কাছে আছে একটি করে তালিকা। তালিকায় আছে তোমরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে যা জানো তা আর বড়দের কাছ থেকে যা জেনেছ তা। এবার তাহলে জানতে হবে অন্য দলগুলোর তালিকায় কি কি আছে। কিন্তু সেটা কীভাবে জানা যাবে? সেটা জানার জন্য এখন তোমাদের সব দল সবার সামনে তাদের তালিকা উপস্থাপন করবে। তাহলে এবারের কাজ হলো-

কাজ-৪ (দলগত উপস্থাপনা)

তোমাদের দলের তালিকাটি সবার সামনে উপস্থাপন করো।

সবার সামনে উপস্থাপন করার ব্যাপারটা অনেকের কাছে কঠিন বা ভয়ের কাজ মনে হলেও আসলে মোটেও তা নয়। তোমরা দলের সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষের সামনে গিয়ে সবাইকে জানাবে যে তোমাদের তালিকাটিতে কি কি আছে। ব্যস! এটুকুই কাজ। তবে কাজটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে করার চেষ্টা করতে হবে। কোন দল হয়তো বড় কাগজে লিখে নিয়ে তাদের তালিকাটি দেখাতে পারে। আবার কেউ কেউ বোর্ডে গিয়ে লিখে দেখাতে পারে। কেউ বা শুধু মুখে বলেও উপস্থাপন করতে পারে। তুমি তোমার দলের সঙ্গে মিলে ঠিক করে নাও যে তোমরা কীভাবে তোমাদের তালিকাটি উপস্থাপন করবে। সব দলের উপস্থাপনা হয়ে গেলে এবার তোমাদের যে কাজটা করতে হবে, সেটা আরও আনন্দের। এবার তোমাদের সব দলের সবকটি তালিকা মিলিয়ে একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। এটা করতে তোমাদের শিক্ষক সহায়তা করবেন। শিক্ষকের কথামতো কাজ করে সহজেই তোমরা এই বড় তালিকাটি তৈরি করে ফেলতে পারবে। তাহলে এবারের কাজ হলো-

কাজ-৫

শিক্ষকের সহায়তায় সব দলের তালিকা মিলিয়ে একটি বড় তালিকা তৈরি করো।

কাজ ৫ শেষ করার পর তোমাদের বড় তালিকা তো হয়ে গেল! কিন্তু এই বড় তালিকাটিতে কি সবকিছু আছে? নিশ্চয়ই না! ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর আরও নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে যা তোমরা জানো না। আবার এই তালিকায় যা যা লিখেছ তার কিছু কিছু হয়তো ভুলও হতে পারে। তাই না? তাহলে, দেয়াল পত্রিকা তৈরির আগে সেসব জেনে নিয়ে ঠিক করে নিতে হবে। কারণ, দেয়াল পত্রিকায় তো ভুল লেখা যাবে না!
তো, তোমরা যা জানো না তা জানার উপায় কী? বা তোমাদের কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধনেরই-বা উপায় কী? তোমাদের শিক্ষক, তা-ই না? শিক্ষকই জানাতে পারবেন আরও নতুন কিছু। আর ভুলগুলোও শুধরে দিতে পারবেন। তিনি হয়তো এর মধ্যেই তোমাদের অনেকের অনেক ভুল শুধরে দিয়েছেন। কিন্তু তার হয়তো আরও অনেক কিছু জানানোর আছে। এবার তাহলে আমরা যাব দেয়াল পত্রিকা তৈরির কাজের ৩ নম্বর ধাপে!

আরো জেনে নিই

এবার শিক্ষক তোমাদের সামনে বেশ কিছু বিষয় উপস্থাপন করবেন। তোমার কাজ হবে শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা আর তিনি কোনো কাজ দিলে তা সঠিকভাবে করার চেষ্টা করা। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করে তা বুঝে নিতে চেষ্টা করবে। তোমাদের বড় তালিকাটির কোন বিষয়টি শিক্ষকের কোন কথার সাথে মিলে যায়, সেটিও বোঝার চেষ্টা করবে। শিক্ষকও এই ব্যাপারে সহায়তা করবেন।
এবার তোমার শিক্ষক তোমাদের সামনে একে একে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরবেন। এই বইটি থেকে পড়েও শিক্ষক যা বলবেন তার অনেক কিছু জেনে নিতে পারো।

আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ)

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা কি কখনো বাতাস দেখেছ? নিশ্চয়ই তোমরা দেখোনি। বাতাস দেখা যায় না তাই বলে কি বাতাসের অস্তিত্ব নেই? বাতাস সরাসরি দেখা না গেলেও বাতাসের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি আমাদের অস্বীকার করার কি কোনো উপায় আছে? নিশ্চয়ই নেই। কারণ, অদৃশ্য হলেও আমরা সবাই এর অস্তিত্ব অনুভব করি। তাই আমরা বাতাসের অস্তিত্বকে স্বীকার ও বিশ্বাস করি। আবার আমাদের শরীরের কোনো অঙ্গে যখন কোনো ব্যথা হয় তাও আমরা সরাসরি দেখতে পাই না কিন্তু অনুভব করি ও বিশ্বাস করি। এমনিভাবে আমাদের ধর্ম ইসলামেও এমন কিছু দিক ও বিষয় আছে যা আমরা সরাসরি চোখে দেখতে পাই না কিন্তু তা সত্য ও বাস্তব। আর এগুলোকে আমাদের দৃঢ়ভাবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হয়। এগুলো ইমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয়। ইসলামে বিশ্বাসের বিষয়সমূহকে বলা হয় আকাইদ। একজন মুমিন হতে হলে সবার আগে আমাদের আকাইদের বিষয়সমূহে বিশুদ্ধ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। নিচের আলোচনা থেকে আমরা আকাইদ সম্পর্কে জানব।

আকাইদ এর ধারণা

'আকাইদ' আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো বিশ্বাসমালা। এটি বহুবচন। এর একবচন আকীদাহ(اَلْعَقِيْدَةُ), যার অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাসকেই 'আকাইদ' বলা হয়। যেমন : আল্লাহ, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, আখিরাত, তাকদির ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। মুমিন হতে হলে সর্বপ্রথম এসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ ইমান বা বিশ্বাসের বিষয়টিকেই আকাইদ বলা হয়।

যে কোনো কাজ করার আগে তার প্রতি যদি আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে তাহলে সে কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মায় না। ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলে সকল মানবিক গুণ অর্জনের জন্যও এ ইমান এবং আকীদাহ বা বিশ্বাস থাকা অপরিহার্য।

কালিমা তাইয়্যেবাহ: ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য যা অন্তরে বিশ্বাসের সাথে মুখে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যা হলো-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ : 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।' এটিকে কালিমা তাইয়্যেবাহ বলা হয়।

কালিমা শাহাদাত: ইমান বলতে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন, তার সবকিছুকে অন্তরে বিশ্বাস করাকে বোঝায়। অন্তরের বিশ্বাসকে জানাতে হলে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে হয়। সেজন্য আরেকটি কালিমা এভাবে রয়েছে-

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল।' এটিকে 'কালিমা শাহাদাত' বলা হয়।

আমরা জানলাম, আকীদাহ হলো ইমানের বিস্তারিত বিষয়সমূহে বিশ্বাস। আল্লাহ এবং আকাইদের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ কেমন হবে তা শুদ্ধরূপে জেনে অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। একইভাবে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সকল প্রমাণিত বৈশিষ্ট্যও বিশ্বাস করতে হবে। যেমন- তিনি যে শেষ নবি তা বিশ্বাস করা। মহানবি (সা.) কে যথাযথ মর্যাদা না দেয়া বা তাঁকে কোনোভাবে হেয় জ্ঞান করা হলে সেটি হবে ইমান-বহির্ভূত এবং মারাত্মক গুনাহ এর কাজ।

ইমান মুজমাল: ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয়টিই হলো আল্লাহ তা'আলা এবং মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর ইমান আনা বা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। তবে ইমান বা বিশ্বাস স্থাপনের পর যদি ইসলামের নিয়ম-নীতি না মানা হয় বা ইসলামের প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয় তবে তা ইমান-আকীদাহ এর পরিপন্থী কাজ হবে।

ইমান সম্পর্কিত এসব বিষয় সবার জানা থাকে না। তাই সংক্ষিপ্তভাবে ইমানের একটি অঙ্গীকার বাণী আছে, যাকে বলা হয় 'ইমান মুজমাল'। যা নিম্নরূপ-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

অর্থ: 'আমি ইমান আনলাম আল্লাহর ওপর ঠিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তাঁর সকল নাম ও গুণসহ। আর আমি তাঁর সকল হুকুম ও বিধি-বিধান গ্রহণ করে নিলাম।'

ইমান মুফাসসাল: কেবল আল্লাহর প্রতি ইমান আনলেই মুমিন হওয়া যায় না; বরং একইসাথে তাঁর প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতিও ইমান আনতে হয়। এ ছাড়া আরো কয়েকটি বিষয়ে ইমান এবং আকীদাহ বা বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এজন্য ইমানের একটি অঙ্গীকার বাণী আছে যাকে 'ইমান মুফাসসাল' বলা হয়। এটি নিম্নরূপ-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَآئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ: 'আমি ইমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি,তাঁর রাসুলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি, তাকদিরের প্রতি যার ভালো-মন্দ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকেই হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

এ কারণেই আমরা আমাদের মহানবি (সা.) এর পূর্বের নবিগণকে এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহে বিশ্বাস করি। তবে তাদের কিতাব ও বিধি-বিধান আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়। আমরা কেবল আমাদের নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর প্রেরিত ওহী তথা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকে অনুসরণ ও অনুকরণ করব। কারণ, ইসলাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অর্থ: 'নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯)

পাঠচক্র

শিক্ষকের সহায়তায় কালিমা তাইয়্যেবাহ, কালিমা শাহাদাত,
ইমান মুজমাল ও ইমান মুফাসসাল অনুশীলন করো।

এ অধিবেশনের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ইসলামে প্রবেশ করতে হলে সবার আগে আমাদেরকে আকাইদের বিষয়সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত কেউ ইমানদার হতে পারে না।

কাজ-৬ (বাড়ির কাজ)

আকাইদের বিষয়াবলিতে বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব সম্পর্কিত
একটি এক পাতার প্রতিবেদন তৈরি করো।

প্রিয় শিক্ষার্থী! উপরোক্ত আলোচনা থেকে আকাইদ তথা ইমানের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে তুমি প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছ। এ শ্রেণিতে আমরা ইমানের বিষয়সমূহের মধ্য থেকে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা করব।

তাওহিদ (اَلتَّوْحِيْدُ)

তাওহিদ এর ধারণা

তাওহিদ (اَلتَّوْحِيْدُ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো একত্ববাদ। পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলা এক ও একক, তাঁর কোনো শরিক নেই–এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করার নাম তাওহিদ। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিজিকদাতা। তিনি ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই। তিনিই হলেন একমাত্র ইলাহ্। তিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলার প্রতি এরূপ বিশ্বাসই হলো তাওহিদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

অর্থ: 'বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন (সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।' (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত : ১-৪)

তাওহিদ এর তাৎপর্য

ইমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে তাওহিদ অন্যতম। ইসলামে তাওহিদের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাওহিদের মূল বাণী হলো– لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।' তিনি সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা। ফলে আসমান ও জমিনের সবকিছু সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। যেমন পবিত্র কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে-

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

অর্থ: 'যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকতো, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২২)

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবি-রাসুল মানুষের নিকট তাওহিদের বাণী প্রচার করছেন।

তাওহিদ এ বিশ্বাসের গুরুত্ব

একজন মানুষকে মুসলিম হতে হলে সর্বপ্রথম তাওহিদে বিশ্বাসী হতে হয়। তাওহিদে বিশ্বাস ছাড়া কোন ব্যক্তি ইমানদার হতে পারে না। তাওহিদের শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নবি-রাসুলগণ আজীবন চেষ্টা করেছেন। একজন মুসলমানের জন্য তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ-

- আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ তৈরি হয়।
- তাওহিদে বিশ্বাসীরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নত করে না। এতে তাদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বেড়ে যায়।
- তাওহিদে বিশ্বাসীরা আল্লাহর গুণাবলির পরিচয় জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করে। ফলে তাদের আচরণ ও চরিত্র সুন্দর হয়।
- তাওহিদে বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে, সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তাই তারা সকলকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে এবং সমাজে সকলের সাথে মিলেমিশে চলতে চেষ্টা করে।
- তাওহিদে বিশ্বাস একজন মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে। তাই তাওহিদে বিশ্বাসীরা আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করার চেষ্টা করে। ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।
- তাওহিদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সবসময় দেখছেন। ফলে সে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে।

দলগত আলোচনা

কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করো।
আলোচনার বিষয়বস্তু: আমরা কেনো তাওহিদে বিশ্বাস করব?

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও মালিক। আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন, 'আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, 'তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।' (সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৩)

আল্লাহর গুণাবলি

আল্লাহ তা'আলা সকল গুণের অধিকারী। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এ মহাজগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি আমাদের নানারকম নিয়ামত দান করেছেন। আলো, বাতাস, পানি, খাদ্যসহ পৃথিবীতে এবং আকাশে যা কিছু আছে সব তারই দান। আল্লাহ তা'আলার রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। এসব নামের মধ্যেই তাঁর গুণাবলি প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এসব গুণাবলি অনুসরণ করলে আমরা চরিত্রবান হতে পারবো এবং সমাজে নৈতিকতা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

নিম্নে আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি গুণবাচক নাম আলোচনা করা হলো:

আল্লাহ রাহিমুন (اَللّٰهُ رَحِيْمٌ)

রাহিমুন অর্থ পরম দয়ালু। আল্লাহ তা'আলা অসীম দয়ালু। সবকিছুর ওপর তাঁর রহমত বিরাজমান। হাদিসে বর্ণিত আছে যে, "কোন এক যুদ্ধবন্দীদলকে মহানবি (সা.)-এর সামনে নিয়ে আসা হলো। এসময় একজন নারী দৌঁড়ে এসে একটি শিশুকে তার পেটের সাথে জড়িয়ে ধরল এবং তাকে দুধ পান করালো, তখন (মহানবি সা.) তাঁর সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি মনে কর যে, এ মহিলা তার সন্তানটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সাহাবিগণ উত্তর দিলেন, আল্লাহর শপথ! কখনই না। তখন মহানবি (সা.) বললেন, 'এ মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটুকু স্নেহশীল ও দয়ালু, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়েও বেশি দয়ালু।' (বুখারী ও মুসলিম।)

আল্লাহ আযিযুন (اَللّٰهُ عَزِيْزٌ)

আযিযুন অর্থ প্রবল পরাক্রমশালী। মহান আল্লাহ সকল শক্তির অধিকারী। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাঁর ক্ষতি করতে পারে না। কোনো ক্ষমতাশীল তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২০)

আল্লাহ মুহাইমিনুন (اَللّٰهُ مُهَيْمِنٌ)

মুহাইমিনুন অর্থ রক্ষক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, হেফাজতকারী। এ সৃষ্টিকুলের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা এবং তিনিই আমাদের রক্ষক। তিনি আমাদের জাগতিক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তাঁরই দেওয়া নিয়ামতের ফলে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

অর্থ: 'তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি ও নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র।' (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩)

আল্লাহ রায্যাকুন (اَللّٰهُ رَزَّاقٌ)

রায্যাকুন অর্থ রিযিকদাতা। মহান আল্লাহ হলেন রিযিকদাতা। রিযিক অর্থ জীবিকা, জীবন উপকরণ ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের সকল প্রাণীর রিযিকের ব্যবস্থা করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বে-হিসাব রিযিক দান করেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

অর্থ : 'ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলেরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর।' (সূরা হুদ, আয়াত: ৬)

আল্লাহ 'আলিমুন (اَللّٰهُ عَلِيْمٌ)

'আলিমুন অর্থ সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ যিনি সবকিছু জানেন বা যিনি সকল জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা হলেন সকল জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জ্ঞান অসীম যা পরিমাপ করা যায় না। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি আসমান-জমিনসহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। আমাদের সকল কথাবার্তা ও কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি জানেন। এমনকি আমাদের অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কেও তিনি জানেন। আমরা যা কল্পনা করি বা স্বপ্ন দেখি সেগুলোও তাঁর জানার বাইরে নয়। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।' (সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত: ১৫৪)

আল্লাহ হাকিমুন (اَللّٰهُ حَكِيْمٌ)

হাকিমুন অর্থ প্রজ্ঞাময়, সুবিজ্ঞ ও সুনিপুণ কর্মদক্ষ। আল্লাহ তা'আলা হলেন প্রজ্ঞাময়, মহান হিকমতের অধিকারী। এ মহাবিশ্ব তিনি সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং মহাপ্রজ্ঞা ও সুদক্ষ কর্মকৌশলের সঙ্গে পরিচালনাও করছেন। আমাদের চারপাশে যে দিকেই তাকাই সর্বত্রই মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা ও সুনিপুণ কর্মকৌশল দেখতে পাই। এ বিষয়ে

পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ বলেন, ‘যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না; তুমি আবার তাকিয়ে দেখো, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?’ (সূরা আল-মুল্‌ক, আয়াত: ৩)

দলগত আলোচনা ও উপস্থাপনা

কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করো এবং আলোচনা শেষে উপস্থাপন করো।
আলোচনার বিষয়বস্তু: আল্লাহর সৃষ্টির মাঝেই তাঁর পরিচয় নিহিত-
এটি আমরা কীভাবে বুঝতে পারি?

তাওহিদের শিক্ষা

আকাইদের সর্বপ্রথম ও প্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদ অর্থ আল্লাহ তা‘আলাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। তাওহিদ থেকে আমরা নিম্নলিখিত শিক্ষা লাভ করতে পারি :

১. আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করব, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করব না।

২. আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর সবকিছু তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য আমরা সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

৩. আল্লাহ তা‘আলা বিপদ-আপদ থেকে একমাত্র মুক্তিদাতা। সুতরাং বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা সব সময় আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করব।

৪. আমরা আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ জানব ও সেই সব নামে তাঁকে ডাকব এবং আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করব।

৫. আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সব সময় দেখছেন এবং আমাদের সকল কাজের হিসাব রাখছেন। সুতরাং আমরা সর্বদা ভালো কাজ করব এবং অন্যায়, অত্যাচার ও সর্বপ্রকার পাপ কাজ থেকে দূরে থাকব।

আচ্ছা, এতসব তুমি কেন পড়ছ বা শিখছ নিশ্চয়ই মনে আছে। তোমাদের একটা দেয়াল পত্রিকা তৈরি করতে হবে, তাই না? এতক্ষণ আমরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে কয়েকটি বিষয় জানলাম। তোমরা যে একটি বড় তালিকা তৈরি করেছিলে সেটির কথা মনে আছে? বইয়ে আকাইদ আর তাওহিদ সম্পর্কে যা যা লেখা আছে বা শিক্ষক তোমাদের যা যা শেখালেন, সেগুলোর কোনো কিছু সম্পর্কে কি তোমাদের তালিকায় ছিলো? মিলিয়ে দেখো তো।

এবার আমরা জানব রিসালাত সম্পর্কে।

রিসালাত (اَلرِّسَالَةُ)

রিসালাত এর ধারণা ও তাৎপর্য

রিসালাত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বার্তা, চিঠি, সংবাদ বহন বা কোনো শুভ কাজের দায়িত্ব বহন করা। ইসলামের পরিভাষায় রিসালাত বলতে মহান আল্লাহর বাণী ও বিধিবিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে বোঝায়। আর আল্লাহ তা'আলা যাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব প্রদান করেন, তাঁকে বলা হয় রাসুল।

রিসালাত-এর প্রায় সমার্থক আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে নবুওয়াত। নবুওয়াত অর্থ অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান। মহান আল্লাহ কর্তৃক রাসুলগণকে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রদান করা হয়েছে তার নাম রিসালাত। আর নবিগণ যে বার্তা লাভ করেন তাকে বলে নবুওয়াত। নবি-রাসুলদের সবাই মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ও প্রেরিত। এ ক্ষেত্রে তাঁদের পরিচয়গত বিশেষ পার্থক্য হচ্ছে- নবিদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিতাব প্রদান করেননি বরং মৌখিক নির্দেশ প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে রাসুলদের প্রতি তিনি মৌখিক নির্দেশের সাথে সাথে আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, নবুওয়াত ও রিসালাত একমাত্র মহান আল্লাহর দান। কোন চেষ্টা সাধনার দ্বারা তা লাভ করা যায় না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষদের মধ্য থেকেও; আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।' (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৫)

মানব জাতির হেদায়েত ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য রিসালাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রিসালাতের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর এককত্ব এবং পরিচয় জানতে পেরেছে। এর মাধ্যমেই সে স্রষ্টার প্রতি অন্য মানুষের প্রতি এবং জীব-জগতের প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য সর্ম্পকে অবহিত হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা এসেছে রিসালাতের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের পক্ষে যা বোঝা সম্ভব নয়, নবি ও রাসুলগণ তা মানুষকে সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রিসালাতের কল্যাণেই মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়েছে। তাই নবি-রাসুলদের প্রচারিত জীবনব্যবস্থাকে ধারণ করা, তাঁদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস আনা, তাঁদের দেখানো পথে চলা এবং সমাজে তা বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করা আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নবি-রাসুলগণের পরিচয়

নবি-রাসুলগণ ছিলেন সৃষ্টির সেরা মানুষ। তাঁরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং প্রেরিত দূত। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে তাঁদেরকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী। তাঁরা তাঁদের ওপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আজীবন নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁরা মানুষকে অসুন্দর, অন্যায়, অপরাধ ও মন্দ কাজের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং সুন্দর, ন্যায়, পরোপকার, কল্যাণকামিতা ও সৎ কাজের শুভ পরিণতি সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের উন্নত চরিত্রে সকল মানবীয় গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছে। তাঁরা ছিলেন মা'সুম বা নিষ্পাপ । তাঁরা সবসময় নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণ সাধনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদের মধ্য থেকে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা অনেক। একমতে, তাঁদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। এর মধ্যে মাত্র ৩১৩ জন ছিলেন রাসুল। নবি-রাসুলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন হযরত আদম (আ.)-যিনি ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানব। আর সর্বশেষ হলেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

নবি-রাসুলের পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলা যাঁদের প্রতি আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন কিংবা নতুন শরিয়ত প্রদান করেছেন, তাঁরা হলেন রাসুল। আর যাঁর প্রতি কোনো কিতাব অবতীর্ণ হয়নি কিংবা যাঁকে কোনো নতুন শরিয়ত দেওয়া হয়নি তিনি হলেন নবি। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়ত প্রচার করতেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক রাসুলই নবি কিন্তু প্রত্যেক নবিই রাসুল নন।

নবি-রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা

নবি-রাসুলগণকে মহান আল্লাহ নিরর্থক প্রেরণ করেননি; বরং দুনিয়াতে তাঁদেরকে প্রেরণ মানুষের প্রতি তাঁর এক বিশেষ অনুগ্রহ। মূলত নানা কারণে নবি-রাসুল প্রেরণ অপরিহার্য ছিলো। এদের মধ্যে অন্যতম হলো–

- মানুষ আল্লাহ তা'আলার পরিচয় জানতো না। নবি-রাসুল ছাড়া কেবল মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে তাঁর পরিচয় জানাও সম্ভব ছিলো না। এ জন্য মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহক হিসেবে যুগে যুগে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে সৃষ্টির সর্বোত্তম মানুষদের নবি-রাসুল হিসেবে মনোনীত করে দুনিয়ার মানুষের কাছে পাঠিয়ে তাঁর পরিচয় প্রদান করেছেন। তাছাড়া মানুষ জানতো না, কোন পথে তাদের কল্যাণ, মুক্তি ও শান্তি নিহিত আছে। নবি-রাসুলগণই এ পথভ্রষ্ট মানুষদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তাঁরাই মানুষদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদেরকে চিন্তায় কর্মে ও আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করেছেন।

- নবি-রাসুলগণ ভালো ও সৎকর্মের শুভ পরিণতির জন্য সুসংবাদদাতা ও খারাপ কাজের পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা মানুষের পরকালীন জীবন সম্পর্কে যেমন অবহিত করেছেন তেমনি আবার কীভাবে মানুষের দুনিয়ার জীবন সুন্দর ও কল্যাণকর হবে তারও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা নবি-রাসুল প্রেরণ না করলে মানব সভ্যতার উন্নয়ন ঘটতো না।

- আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। দুনিয়াতে নবি-রাসুল না পাঠিয়ে এবং মানুষকে আখিরাতের জীবন সম্পর্কে সতর্ক না করে তাদের অন্যায় ও পাপ কাজের জন্য পরকালে শাস্তি দেওয়া তাঁর অভিপ্রায় নয়। এ জন্য তিনি যুগে যুগে সতর্ককারী হিসেবে নবি- রাসুলগণকে এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ হলো, নবি-রাসুলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন বা তাঁরা আল্লাহর যে বাণী আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। তাওহিদে বিশ্বাসের পরই রিসালাতে বিশ্বাস

করা অপরিহার্য। রিসালাত তথা নবি-রাসুলগণকে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা নবি-রাসুলগণই আমাদেরকে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস না করলে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বাণীকে অস্বীকার করা হয়। তাই রিসালাতে বিশ্বাস তাওহিদে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করে। রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অপরিহার্য একটি অঙ্গ। ।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাত

নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হলেন সর্বশেষ। তিনি একাধারে নবি ও রাসুল। কারণ তিনি নতুন শরিয়ত ও কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁকে প্রদত্ত দীন বা জীবনবিধানের নাম 'ইসলাম' এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ আসমানি কিতাবের নাম 'আল কুরআন'। তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে এ পৃথিবীতে আগমন করেন এবং ৪০ বছর বয়সে অর্থাৎ ৬১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। তাঁর পূর্বের রাসুল হযরত ঈসা (আ.)-এর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের সময়কাল থেকে তাঁর নবুওয়াত লাভের মাঝে সময়ের ব্যবধান ছিল ৫০০ বছরের বেশি। এ দীর্ঘ সময় ধরে কোনো নবি-রাসুলের আগমন না ঘটায় সারা পৃথিবীর মানুষ তখন পথভ্রষ্টতা, অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার ও পাপাচারের চরম সীমায় পৌঁছেছিল। এ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে জগৎসমূহের রহমত ও বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হিসেবে প্রেরণ করেন।

মানবতার কল্যাণের জন্য জগতে যত নবি-রাসুল এসেছিলেন তাঁরা কেবল কোনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্ববিষয়ে ও সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। অন্য নবি-রাসুলগণ কোনো বিশেষ অঞ্চল বা বিশেষ সময়ের জন্য প্রেরিত; কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সকল দেশ, জাতি এবং সর্বকালের জন্য প্রেরিত। তাই তিনি হলেন বিশ্বনবি। তাঁর শরিয়ত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে দীন ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। মহানবি (সা.) এর রিসালাত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনিই তাঁর রাসুলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর একে জয়যুক্ত করবার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা আল-ফাত্হ, আয়াত: ২৮)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবি। তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবি-রাসুল আগমনের ধারা বন্ধ হয়েছে। তাঁর পরে আর কোনো নবি-রাসুল এ দুনিয়াতে আসবেন না। এ জন্য তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। তাঁকে শেষ নবি আখ্যা দিয়ে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولَ
اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا

অর্থ: 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০)

আমরা সকল নবি-রাসুলের প্রতি ইমান আনবো এবং আমাদের নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর দেখানো পথে আমাদের জীবন পরিচালনা করব।

বই এবং শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার পর তুমি নিজের মতো করে গুছিয়ে রিসালাত সম্পর্কে যা যা জানলে তা বন্ধুদের সামনে উপস্থাপন করবে। তোমার অন্য সব বন্ধুরাও উপস্থাপন করবে। সবার উপস্থাপনা থেকে আরও ভালোভাবে বিষয়টি সম্পর্কে বুঝতে পারবে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন

রিসালাত সম্পর্কে একটি এক পাতার প্রতিবেদন তৈরি করে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

এবার আমরা জেনে নেবো আকাইদের আরেকটি মৌলিক বিষয়- আখিরাত সম্পর্কে।

আখিরাত (اَلْآخِرَةُ)

আখিরাত-এর ধারণা

আখিরাত আরবি শব্দ। এর অর্থ পরকাল, পরজীবন, মরণোত্তর বা শেষ জীবন। ইসলামের পরিভাষায় আখিরাত বলতে মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বোঝায়।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে আখিরাতের জীবনকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের নাম হলো 'বারযাখ' (بَرْزَخٌ) বা কবরের জীবন, যা মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় পর্যায় হলো, কিয়ামত থেকে অনন্তকাল অবধি।

মহান আল্লাহর নির্দেশে কিয়ামতের মাধ্যমে জগতের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর যখন আল্লাহর ইচ্ছা হবে তখন তিনি আবার সকলকে জীবিত করবেন। সকলে পুনরুত্থিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এরপর দুনিয়ার সকল কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। জান্নাত কিংবা জাহান্নামে প্রবেশের মাধ্যমে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করবে। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের এ পর্যায় বা স্তরসমূহকে বলা হয় আখিরাত।

আখিরাতে বিশ্বাস বলতে বোঝায়, এ দুনিয়ার জীবনই মানুষের জন্য শেষ নয়, দুনিয়ার জীবনের কর্মফল বা প্রতিদান ভোগ করার জন্য পরকালের জীবন রয়েছে, যা হবে অনন্তকাল, এ ধারণাটিতে বিশ্বাস করা। আখিরাতে বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক আকিদাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

অর্থ: 'আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪)

তাৎপর্য

আখিরাতের জীবন অনন্তকালের। এ জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। আখিরাতের তুলনায় মানুষের দুনিয়ার জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী। মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।' (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ৩৯)

মাতৃগর্ভ থেকে ভুমিষ্ঠ হওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের দুনিয়ার জীবনের শুরু হয়। আর মৃত্যুর মাধ্যমে এ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহজীবনের কর্মের জন্য মানুষকে তার মৃত্যু-পরবর্তী আখিরাত জীবনে জবাবদিহি করতে হবে। দুনিয়ার জীবনে যারা ভালো কাজ করবে, আখিরাতের জীবনে তারা তার সুফল ভোগ করবে।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাতে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম একটি মৌলিক বিষয়। তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের সাথে সাথে আখিরাতের জীবনকেও সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস ও স্বীকার করা জরুরি। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৬)

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের দুনিয়ার জীবনের সকল কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ, আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আখিরাতে তার সকল কাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই জবাবদিহিতার ভয়ে সে তার কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্ক থাকে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে। আবার সে বিশ্বাস করে যে দুনিয়ার সকল ভাল কাজের পুরষ্কার আখিরাতে পাওয়া যাবে। তাই সে ভাল কাজে আগ্রহী হয় এবং মন্দ কাজ পরিহার করে চলে। এ ভাবে আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলে।

সর্বোপরি, আখিরাতে বিশ্বাসের ফলে মানুষের ইহকাল ও পরকালের জীবন সুন্দর, সফল, সার্থক ও শান্তিপূর্ণ হয়। তাই আমরা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস করব।

নিজে করি

আখিরাত বিষয়ক পাঠ থেকে আমাদের জীবনে করণীয় ও বর্জনীয়–

করণীয়	বর্জনীয়
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

আখিরাতের জীবনের স্তরসমূহ

মৃত্যু (اَلْمَوْتُ)

মৃত্যুর মাধ্যমে আখিরাতের জীবন শুরু হয়। মৃত্যুকে আরবিতে বলা হয় 'মাউত'। জীবন যেমন মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি মৃত্যুও মহান রাব্বুল আলামিনের নির্দেশেই হয়ে থাকে। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।' (সূরা আল-মুল্‌ক, আয়াত: ২)

মৃত্যু থেকে কারও বাঁচার কোনো উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থ: 'জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।' (সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত: ১৮৫)

কবর বা বারযাখ (بَرْزَخٌ)

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে কবর বা বারযাখের জীবন বলা হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

অর্থ: 'আর তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।' (সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত: ১০০)

কবর বা বারযাখ জীবনে মুনকার ও নাকীর নামে দুজন ফেরেশতা তিনটি প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলো হলো-

১. তোমার রব কে?

২. তোমার দীন কী?

৩. রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হবে, এ ব্যক্তি কে?

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশমতো চলে তারা এ প্রশ্নেসমূহের সঠিক জবাব দিতে পারবে। তারা বলবে, আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দীন এবং ইনি মুহাম্মাদ (সা.) আমার নবি। এরপর তাদের কবর হবে জান্নাতের মতো সুখের স্থান। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশমতো চলে না, তারা উত্তর দিতে পারবে না। তাদের কবর হবে অত্যন্ত কষ্টের জায়গা।

কিয়ামত (اَلْقِيَامَةُ)

কিয়ামত আখিরাত জীবনের একটি স্তর। ইসলামি বিশ্বাস মোতাবেক কিয়ামতের দুটি অবস্থা রয়েছে। আর তা হলো– মহাপ্রলয় এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে হাশরের ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়া।

আল্লাহ এ বিশ্বজগতের সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ ও জিন জাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করার জন্য। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে যাবে। তাঁর নাম নেওয়ার মতো আর কেউ থাকবে না। তখন মহান আল্লাহ এ বিশ্বজগৎ ধ্বংস করে দেবেন। মহান আল্লাহর হুকুমে নির্দিষ্ট সময়ে হযরত ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। এর ফলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশ্বজগতের এ ধ্বংসের নাম কিয়ামত। একে মহাপ্রলয়ও বলা হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

অর্থ : 'আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল।' (সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৮)

এ মহাবিশ্বের সবকিছু ধ্বংসের বহু সময় পরে আবার আল্লাহর হুকুমে হযরত ইসরাফিল (আ.)-এর দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে মানুষ কবর থেকে এবং যে যেখানে থাকবে সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবে। এ উত্থানকে কিয়ামত বলা হয়। একে পুনরুত্থান দিবসও বলা হয়। কিয়ামতের এ দু'টি অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।' (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৮)

হাশর (اَلْحَشْرُ)

হাশর শব্দের অর্থ মহাসমাবেশ বা একত্রিত হওয়া। পুনরুত্থানের পর ভীত-শঙ্কিত জিন ও মানুষ একজন আহ্বানকারী ফেরেশতার ডাকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত হবে। ইসলামের পরিভাষায় এর নাম হাশর বা মহাসমাবেশ। মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا

অর্থ: 'সে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।' (সূরা আন-নাবা, আয়াত: ১৮)

মানুষ যে ময়দানে একত্রিত হবে ওই স্থানটিকে 'হাশরের ময়দান' বা পুনরুত্থানের ময়দান নামে আখ্যায়িত করা হয়। সেখানে মানুষ ও জিন জাতির কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ নেওয়া হবে এবং বিচারকার্য সমাধা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা হবেন বিচারক আর সাক্ষী হবেন নবি-রাসুল ও ফেরেশতাগণ।

হাশরের ময়দানে মানুষের আমলনামা দেওয়া হবে। পুণ্যবানেরা ডান হাতে এবং পাপিরা বাম হাতে আমলনামা পাবে। হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের সকল কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও; এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে- যিনি এক পরাক্রমশালী।' (সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৪৮)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন 'এটা (পুনরুত্থান) এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।' (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৫১)

মীযান (اَلْمِيْزَانُ)

মীযান শব্দের অর্থ মানদণ্ড বা ওজন পরিমাপক। হাশরের দিন মানুষ ও জিনের পাপ-পুণ্যের ওজন করা হবে। আর যে পরিমাপক দ্বারা হাশরের দিন পাপ-পুণ্যের ওজন করা হবে তাকে ইসলামি পরিভাষায় মীযান বলা হয়। ভালো হোক, মন্দ হোক, মানুষের আমল তিল পরিমাণ ওজনের হলেও আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন তা উপস্থাপন করবেন এবং মীযানে তা ওজন করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি সরিষা পরিমাণ হয়, তবুও আমি তা উপস্থিত করব।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৪৭)

মীযানে যাঁদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে, তাঁরা হবেন জান্নাতের অধিবাসী। আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা হবে জাহান্নামি। মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের (পুণ্যের) পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।' (সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত: ১০২-১০৩)

মীযানে পুণ্যের পাল্লা ভারী করার জন্য আমাদের মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলতে হবে এবং বেশি বেশি পুণ্যের কাজ করতে হবে।

সিরাত (اَلصِّرَاطُ)

সিরাত অর্থ পথ, রাস্তা, পুল ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সিরাত এমন একটি পুল যা কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের ওপর স্থাপিত হবে। হাশরের ময়দানে বিচারকাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সকল মানুষকে এ সিরাত অতিক্রম করতে হবে। সিরাত চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তরবারি অপেক্ষা অধিক ধারালো হবে। (মুসলিম)

আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বপ্রথম এ সিরাত অতিক্রম করবেন। ইমানদার তথা জান্নাতিগণ সিরাতের ওপর দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। ইমানদারদের আমল অনুসারে সিরাত নানারকম হবে। কারও জন্য সিরাত হবে বিশাল মাঠের মতো। নিজ নিজ নেক আমল অনুসারে ইমানদারগণ অতি সহজে সিরাত অতিক্রম করতে থাকবেন। কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, আবার কেউ দ্রুত কদমে সিরাত অতিক্রম করবেন।

আর যারা জাহান্নামি হবে তারা সিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। তারা তা অতিক্রম করতে গিয়ে জাহান্নামে নিপতিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা (সিরাত) অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। তারপর আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব। (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭১-৭২)

জান্নাত (اَلْجَنَّةُ)

জান্নাত আরবি শব্দ। এর অর্থ উদ্যান বা বাগান। অভিধানে 'জান্নাত' এমন বাগানকে বলা হয় যার রয়েছে ঘন বৃক্ষরাজি। ফার্সি ভাষায় জান্নাতকে 'বেহেশত' বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায়, দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনের পর পুণ্যবান মু'মিনদের জন্য পরকালে আল্লাহ তা'আলা যে অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রেখেছেন, তার নাম জান্নাত। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৪)

জান্নাত পরম সুখ-শান্তির স্থান। সেখানে রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু বা কোনো অশান্তি নেই। জান্নাতে আছে আরামের সব রকম ব্যবস্থা। সেখানকার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। মন যা চাইবে সেখানে তা পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো। এটি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন।' (সূরা হা-মীম আস-সাজদা (ফুসসিলাত), আয়াত : ৩১-৩২)

জান্নাতের স্তর: আল-কুরআন ও হাদিসে জান্নাতের আটটি স্তরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো-

১. জান্নাতুল ফিরদাউস	৫. দারুন নাঈম
২. জান্নাতুল মা'ওয়া	৬. জান্নাতু আদ্‌ন
৩. দারুল মাকাম	৭. দারুল খুল্‌দ
৪. দারুল ক্বারার	৮. দারুস্ সালাম।

জাহান্নাম (جَهَنَّمُ)

জাহান্নাম অর্থ আগুনের গর্ত, দোযখ, শাস্তির স্থান। ইসলামি পরিভাষায়, হাশরের ময়দানে বিচারের পর পাপীদের যে স্থানে শাস্তির জন্য প্রেরণ করা হবে, তাই জাহান্নাম।

যারা আল্লাহ, রাসুল ও ইমানের অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলোকে অস্বীকার করবে এবং বিভিন্ন অন্যায় ও পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিপতিত করা হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'তবে যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাস।' (সূরা আন-নাযি'আত, আয়াত : ৩৭-৩৯)

জাহান্নামে দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। সেখানে আছে ভীষণ শাস্তি। সেখানে রয়েছে প্রজ্বলিত আগুন, যা শরীরের মাংস হাড় থেকে পৃথক করে দেবে। আবার সৃষ্টি হবে নতুন মাংস ও চামড়া। এভাবে পাপীরা জাহান্নামে অনন্তকাল ধরে আগুনে পুড়তে থাকবে। জাহান্নামের আগুনের দহন ক্ষমতা দুনিয়ার আগুনের দহন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের নবি কারীম (সা.) বলেন, 'তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।' (বুখারি) জাহান্নামে আগুন ছাড়াও নানা রকম শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

জাহান্নামের স্তর: অবিশ্বাসী ও পাপীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ সাতটি জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। এগুলো হলো-

১. জাহান্নাম	২. লাযা
৩. হুতামাহ	৪. সাঈর
৫. সাকার	৬. জাহীম
৭. হাবিয়া	

আখিরাতে বিশ্বাসের প্রভাব

ধর্মের মূল চেতনা হলো বিশ্বাস- যা মানব জীবনের মূল চালিকাশক্তি। ইসলামি জীবন দর্শনে বিশ্বাসের অন্যতম মৌলিক বিষয় তিনটি। এগুলো হলো– তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, রিসালাত তথা নবি-রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস এবং আখিরাত অর্থাৎ পরকালের প্রতি বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস ইমানের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ইহজীবনে যে ভালো কাজ করবে আখিরাতে তার জন্য পুরস্কার থাকবে। আবার ইহজীবনে যে খারাপ কাজ করবে আখিরাতে তার জন্য শাস্তি অপেক্ষা করছে। তাই আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সৎকর্মশীল ও দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে তোলে। আখিরাতের স্বার্থে সে দুনিয়ায় ভালো কাজ করতে উৎসাহী হয় এবং খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। মহান আল্লাহ বলেন, 'পক্ষান্তরে যে তার প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।' (সূরা আন-নাযি'আত, আয়াত: ৪০-৪১)

সর্বোপরি, আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মের অনুপ্রেরণা জোগায়। আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি বিপদে ধৈর্যশীল হয় এবং অল্পে তুষ্ট থাকে। এছাড়া আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অশ্লীল কাজকর্ম– এককথায় সকল মন্দ কাজ ও পাপাচার থেকে রক্ষা করে তাঁর চরিত্রকে পবিত্র রাখে। এর ফলে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন সুন্দর, সফল, সার্থক ও শান্তিপূর্ণ হয়। তাই আমরা আখিরাত জীবনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখব এবং উন্নত চরিত্র গঠন করব।

নৈতিক চরিত্র গঠনে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা

নৈতিক চরিত্র গঠনে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি, ইসলামের মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম আকাইদ। আকাইদের মৌলিক বিষয় তিনটি। যথা- তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত। নৈতিক চরিত্র বলতে বোঝায় কথা ও কাজে উত্তম রীতি-নীতির অনুশীলন, মার্জিত ও বিনয়ী হওয়া, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া, সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা ইত্যাদি। দুর্নীতি, অন্যায়, অশ্লীল, অশালীন ও পাপকর্মসমূহ পরিত্যাগ করা এবং অন্য ধর্মের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করাও নৈতিক চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

নৈতিক চরিত্র মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। চরিত্রহীন মানুষের নীতিবোধ থাকে না। সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ কোনো কিছুরই সে পরোয়া করে না। সে শুধু নিজের লাভ ও কল্যাণই বোঝে। নীতিহীন মানুষও ঠিক তেমনি। সে কোনোরূপ আইন-কানুন, বিধি-বিধান মানতে চায় না। সে নৈতিক আচরণ প্রদর্শনে যত্নবান নয়; বরং নিজের লাভের জন্য সে অপরের ক্ষতিসাধন করে থাকে। মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা দেওয়া, পরচর্চা ইত্যাদি আচরণ তার চরিত্রে ফুটে ওঠে। সমাজে সে নানারূপ অশান্তি সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের কেউই তাকে বিশ্বাস করে না। কোনো মানুষ তাকে ভালোবাসে না।

অন্যদিকে নৈতিকতা মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। নৈতিক চরিত্রবান মানুষ সমাজে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে। সকলেই তাঁকে সম্মান করে। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সমাজের লোকজন সবাই তার ওপর আস্থা রাখে।

তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের সাথে নৈতিক চরিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ইসলামের এই বিশ্বাসসমূহ মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি আকাইদের এই বিষয়গুলো বিশ্বাস করে, তার চরিত্র সুন্দর হয়। সে সবসময় নীতি ও উত্তম আদর্শের অনুসরণ করে। অন্যায়-অত্যাচার, অশ্লীলতা থেকে সে সর্বদা দূরে থাকে। সে কখনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না; বরং সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়।

তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো অনৈতিক কাজ করতে পারে না। কারণ, সে জানে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সর্বদা দেখছেন এবং তার সকল কাজের হিসাব রাখছেন। সুতরাং সে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার হুকুমমতো জীবনযাপন করে। অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে।

আবার রিসালাতে বিশ্বাসী মানুষ নবি-রাসূলগণের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাঁদের মতো সে-ও উত্তম চরিত্র অনুশীলন করে। উদ্ধত ও অশালীন চলাফেরা, অনৈতিক আচার-আচরণ ও অশ্লীল কথাবার্তা তার থেকে কখনও প্রকাশ পায় না।

এমনিভাবে আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ জানে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে সব সময় দেখছেন ও তার সব কথা শুনছেন এবং হাশরের ময়দানে তাকে তার সকল কর্মের হিসাব দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তা-ও সে দেখবে।" (সূরা আল-যিলযাল, আয়াত : ৭-৮)

যে দুনিয়াতে ভালো ও নেক কাজ করবে, সে আখিরাতে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করবে। আর দুনিয়ায় যে অন্যায় ও পাপ কাজ করবে আখিরাতে সে চরম শাস্তির মুখোমুখি হবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করে। আখিরাতের সফলতা ও শান্তির আশায় মানুষ ভালো কাজ করে, সকলের সাথে মিলেমিশে চলে এবং উত্তম চরিত্রবান হয়। অন্যদিকে আখিরাতের শাস্তির ভয়ে মানুষ মন্দ ও অশ্লীল কাজ পরিত্যাগ করে। অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। এভাবে মানুষ আখিরাতে বিশ্বাসের ফলে নৈতিকতা অনুশীলন করে থাকে।

অতএব, নৈতিক চরিত্র গঠনে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা দৃঢ়ভাবে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করব। আমাদের জীবনে নৈতিকতার অনুশীলন করব, অনৈতিক কাজ থেকে সব সময় দূরে থাকব। তাহলেই আমরা ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করতে পারব।

মুক্ত আলোচনা এবং দেয়াল পত্রিকা তৈরি

এতক্ষণে তুমি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেক ধারণা পেয়ে গেছ! আশা করি সবকিছু বুঝতেও পেরেছো। এই যে এতকিছু তুমি এখন জানো এই সবকিছু কি তোমাদের তৈরি করা সেই তালিকায় ছিল? যদি না থেকে থাকে, তাহলে দেখো, আরও কত তথ্য পেয়ে গেলে এখন তোমরা। এই সব তথ্য নিয়ে এখন কাজটা কি মনে আছে? দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা, তাই না? এখন তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে দেয়াল পত্রিকায় লেখার জন্য অনেক কিছু আছে। ঝটপট লিখে ফেলো সেই সবকিছু আর তোমাদের শিক্ষককে দেখিয়ে কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করে নাও! বন্ধুদের সঙ্গেও আলোচনা করে নাও যাতে সবাই একই লেখা লিখে না ফেলে। একই সঙ্গে তোমরা সবাই মিলে তোমাদের দেয়াল পত্রিকাটির ডিজাইন কেমন হবে, কাগজ কী হবে, কোন কোন রঙে লেখা হবে সেই সবকিছুও ঠিক করে ফেলো।

মানে দেয়াল পত্রিকা তৈরির কাজের ৪ এবং ৫ নম্বর ধাপের কাজগুলো করে ফেলো! আর সবাই মিলে শিক্ষকের সহায়তায় নিজেদের কাজগুলো ভাগ করে ভালোভাবে বুঝে নাও। আর কিন্তু বেশি সময় নেই! দেয়াল পত্রিকা তৈরি করে সবার সামনে উপস্থাপন করতে হবে তো!

দেয়াল পত্রিকার এই সব লেখালেখির কাজ করতে গিয়ে কোথাও কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই শিক্ষকের সহায়তা নেবে। শিক্ষকও তোমাদের সঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিষয় বা বিশ্বাসের ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। তার আলোচনাগুলোও মন দিয়ে শুনবে। সেখান থেকেও হয়তো তোমরা দেয়াল পত্রিকায় লেখার মতো কিছু পেয়ে যেতে পারো!

আর শুধু দেয়াল পত্রিকা তৈরি করলেই হবে না, একটা বড় অনুষ্ঠান করে দেয়াল পত্রিকাটি উদ্বোধনও করতে হবে। তাহলে, সেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিতে হবে না? অনুষ্ঠানে কাদেরকে দাওয়াত করবে তা-ও ঠিক করে নিতে হবে। আর দাওয়াতের জন্য কার্ডও বানাতে হবে।

তাহলে এখন তোমাদের কাজগুলো হলো-

কাজ-৭ (দেয়াল পত্রিকার মূল কাজ)

১. দেয়াল পত্রিকার জন্য লেখা ঠিক করা এবং শিক্ষককে দেখিয়ে লেখার ভুল সংশোধন করা।

২. দেয়াল পত্রিকাটি বানিয়ে ফেলা।

৩. দাওয়াত কার্ড বানিয়ে সেটি বিতরণের মাধ্যমে দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে দাওয়াত দেওয়া।

৪. দেয়াল পত্রিকার উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি কীভাবে চলবে (অনুষ্ঠানসূচি) তা ঠিক করা এবং অনুষ্ঠানে কে কোন কাজ করবে তা ঠিক করা।

৫. অনুষ্ঠানসূচি অনুসারে যার যে কাজ তা ঠিকভাবে করার প্রস্তুতি নেওয়া।

দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন

একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতিথিদের উপস্থিতিতে দেয়ালপত্রিকাটি উদ্বোধন করা হবে। এ সময় দেয়াল পত্রিকার কোন কাজটি তোমরা করেছ তা সবাইকে জানাবে। অথবা, তোমাদেরকে যদি অনুষ্ঠানে বিশেষ কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয় সেটি পালন করবে। দেয়াল পত্রিকা দেখে কে কী বলছে সেগুলোর নোট নেওয়ার চেষ্টা করবে। এটি তোমাদেরকে পরে অনেক সাহায্য করবে।

অন্যকে জানানো

দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়ে গেলে তোমরা শিক্ষকের সাথে বসে অনুষ্ঠানে কী কী হলো তা নিয়ে আলোচনা করবে। তোমাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে যদি তুমি আরও জানতে চাও তাহলে এ সময় শিক্ষককে জিজ্ঞেস করবে। শিক্ষক তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি হয়তো তোমাদের আরও তথ্য কোথা থেকে পেতে পারো তা-ও জানিয়ে দেবেন।

এবার তোমাকে একটু বাড়ির কাজ করতে হবে। কাজটা হলো–

কাজ-৮ (বাড়ির কাজ)

দেয়াল পত্রিকা তৈরি এবং উদ্বোধনের এই পুরো অভিজ্ঞতাটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

প্রতিবেদনে থাকবে–

১. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে তুমি কী জানো?
২. কেন ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন?
৩. দেয়াল পত্রিকা তৈরির এই কাজটি থেকে তুমি কী কী শিখলে?

বাড়ির কাজটি করে এনে সেখানে তোমাদের শিক্ষকের স্বাক্ষর বা সাইন নেবে। কারণ, তারপর তোমাদের আর একটি ছোট্ট কাজ করতে হবে। শিক্ষকের স্বাক্ষর করা এই প্রতিবেদনটি নিয়ে গিয়ে এবার তোমাকে কী করতে হবে জানো? এবার তুমি তোমার থেকে বয়সে ছোট কাউকে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কী তা শেখাবে বা বোঝানোর চেষ্টা করবে। পারবে না? কঠিন মনে হলেও কাজটা আসলে ততটা কঠিন না। একবার চেষ্টা করেই দেখো।

এই কাজটি করার মাধ্যমেই আমাদের ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের কাজটি শেষ হবে।